amarboi.org

নামায রোযার হাকীকত

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

boipori.com

ইবাদাত

'ইসলামের হাকীকত' গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধে 'দ্বীন' ও 'শরীয়াত' এ শব্দ দু'টির প্রকৃত অর্থ এবং ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আমি 'ইবাদাত' শব্দটির বিস্তারিত অর্থ আপনাদের সামনে পেশ করবো। এ শব্দটি সর্বসাধারণ মুসলমান প্রায়ই বলে থাকে ; কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ অনেকেই জানে না। আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে বলেছেনঃ

"আমি জিন ও মানব জাতিকে কেবল আমারই ইবাদাত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।" (সূরা আয যারিয়াতঃ ৫৬)

এ থেকে নি:সন্দেহে বুঝা গেল যে, মানুষের জন্ম, জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত এবং বন্দেগী ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন আপনারা সহজেই বুঝতে পারেন যে, 'ইবাদাত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ জেনে নেয়া আমাদের পক্ষে কতখানি জরুরী। এ শব্দটির অর্থ না জানলে যে মহান উদ্দেশ্যে আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা আপনি কখনই লাভ করতে পারেন না। আর যে তার উদ্দেশ্য লাভ করতে পারে না তা ব্যর্থ ও নিস্ফল হয়ে থাকে।

চিকিত্সক রোগীকে নিরাময় করতে না পারলে বলা হয় যে, সে চিকিত্সায় ব্যর্থ হয়েছে, কৃষক ভাল ফসল জন্মাতে না পারলে কৃষিকার্যে তার ব্যর্থতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। তেমনি আপনারা যদি আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য লাভ অর্থাত্ ইবাদাত করতে না পারেন তবে বলতে হবে যে, আপনাদের জীবন ব্যার্থ হয়েছে। এজন্যই আমি আশা করি আপনারা এ 'ইবাদাত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও তাত্পর্য জানার জন্য বিশেষ মনোযোগী হবেন এবং তা আপনাদের হৃদয়-মগযে বদ্ধমূল করে নিবেন। কারন মানব জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা এরই ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে।

ইবাদাত শব্দটি আরবী 'আবদ' হতে উদ্ভূত হয়েছে। 'আবদ' অর্থ দাস ও গোলাম। অতএব 'ইবাদাত' শব্দের অর্থ হবে বন্দেগী ও গোলামী করা। যে ব্যক্তি অন্যের দাস সে যদি তার বাস্তবিকই মনিবের সমীপে একান্ত অনুগত হয়ে থাকে এবং তার সাথে ঠিক ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করে, তবে একে বলা হয় বন্দেগী ও ইবাদাত। পক্ষান্তরে কেউ যদি কারো চাকর হয় এবং মনিবের কাছ থেকে পুরোপুরি বেতন আদায় করে, কিন্তু তবুও সে যদি ঠিক চাকরের ন্যায় কাজ না করে তবে বলতে হবে যে, সে নাফরমানী ও বিদ্রোহ করেছে। আসলে একে অকৃতজ্ঞতাই বালা বাঞ্ছনীয়। তাই সর্বপ্রথম জানতে হবে, মনিবের সামনে 'চাকরের' ন্যয় কাজ করা এবং তার সমীপে আনুগত্য প্রকাশ করার উপায় কি হতে পারে।

বান্দাহ বা চাকরেকে প্রথমতে মনিবকে 'প্রভু' বলে স্বীকার করতে হবে এবং মনে করতে হবে যে, যিনি আমার মালিক, যিনি আমাকে দৈনন্দিন রুজী দান করেন এবং যিনি আমার মালিক, যিনি আমার হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন তাঁরই আনুগত হওয়া আমার কর্তব্য। তিনি ছাড়া অন্য কেউই আমার আনুগত্য লাভের অধিকারী নয় । সকল সময় মনিবের আনুগত্য করা, তাঁর হুকুম পালন করা, তার অনুবর্তিতা মূহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ না করা, মনিবের বিরুদ্ধে মনে কোন কথার স্থান না দেয়া এবং অন্য কারো কথা পালন না করাই বান্দাহর দ্বিতীয় কর্তব্য। গোলাম সবসময়ই গোলাম ; তার এথা বলার কোন অধিকার নেই যে, আমি মনিবের এ আদেশ মানবো আর অমুক আদেশ মনবো না। কিংবা আমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মনিবের গেলাম আর অন্যান্য সময় অমি তার গোলামী হতে সম্পূর্ণ আযাদ ও মুক্ত।

মনিবের প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন এবং তার সমীপে আদব রক্ষা করে চলা বান্দার তৃতীয় কাজ। আদব ও সম্মান প্রকাশের যে পন্থা মনিব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেই সময়ে নিশ্চিতরূপে উপস্থিত হওয়া এবং মনিবের আনুগত্য ও দাসত্ব স্বীকার করে নিজেকে প্রতিজ্ঞা ও আন্তরিক নিষ্ঠা প্রমাণ করা একান্ত আবশ্যক।

এ তিনটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে যে কার্যটি সম্পন্ন হয়ে আরবী পরিভাষায় তাকেই বলে 'ইবাদাত'। প্রথমত, মনিবের দাসত্ব স্বীকার, দ্বিতীয়ত, মনিবের অনুগত্য এবং তৃতীয়ত, মনিবের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে : আল্লাহ তায়ালা জিন ও মানব জাতিকে একমাত্র এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যে, তারা কেবল আল্লাহ তায়ালরই দাসত্ব করবে অন্য কারো নয়, কেবল আল্লাহর হুকুম পালন করবে, এছাড়া অন্য কারো হুকুম অনুসরন করবে না এবং কেবল তাঁরই সামনে সম্মান সম্ভ্রম প্রকাশের জন্য মাথা নত করবে, অন্য কারো সামনে নয়। এ তিনটি জিনিসকে আল্লাহ তয়ালা বুঝিয়েছেন এ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'ইবাদাত' দ্বারা। যেসব আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইবাদাতের নির্দেশ দিয়েছেন তার অর্থ এটাই। আমাদের শেষ নবী এবং তাঁর পূর্ববতীর্ আম্বিয়ায়ে কেরামের যাবতীয় শিক্ষার সারকথা হচ্ছে : "আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করো না" অর্থাত্ দাসত্ব ও অনুগত্য লাভের যোগ্য সারা জাহানে একজনই মাত্র বাদশাহ আছেন ---- তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা ; অনুসরণযোগ্য মাত্র একটি বিধান বা আইন আছে --- তাহলো আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা এবং একটি মাত্র সত্তাই আছে, যার পূজা-উপাসনা, আরাধনা করা যেতে পারে। আর সেই সত্তাই হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ।

ইবাদাত শব্দের এ অর্থ আপনি স্মরণ রাখুন এবং আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে থাকুন। একটি চাকর যদি মনিবের নির্ধারিত কর্তব্য পালন না করে বরং তাঁর সামনে কেবল হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, লক্ষ বার কেবল তার নাম জপে, তবে এ চাকরিটি সম্পর্কে আপিনি কি বলেবেন? মনিব তাকে অন্যান্য মানুষের প্রাপ্য আদায় করতে বলেন। কিন্তু সে কেবল সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে মনিবের সমনে মাথা নত করে দশবার সালাম করে এবং আবার হাত বেঁধে দাঁড়ায়। মনিব তকে অনিষ্টকর কাজগুলে বন্ধ করতে আদেশে করেন। কিন্তু সে সেখান থেকে একটুও নড়ে না। বরং কেবল সিজদাহ করে থাকে । মনিব তাকে চোরের হাত কাটতে বলেন। কিন্তু সে দিঁড়িয়ে থেকে সুললিত কণ্ঠে বিশবার পড়তে বা উচ্চরণ করত থাকে----'চোরের হাত কাট' কিন্তু সে একবারও একম শাসনব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে না যার অধীনে চোরের হাত কাঁটা সম্ভব হবে। এমন চাকর সম্পর্কে কি মন্তব্য করবেন? আপনি কি বলতে পারেন যে, সে প্রকৃতপক্ষে মনিবের বন্দেগী ও ইবাদত করছে? আপনার কোন চাকর এরূপ করলে আপনি তাকে কি বলবেন তা অমি জনি না, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আল্লাহর যে চাকর এরূপ আচরণ করে তাকে আপনি 'বড় আবেদ' (ইবাদাতকারী, বুজুর্গ ইত্যাদি) নামে অভিহিত করেন। এরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কুরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালার কত শত হুকুম পাঠ করে, কিন্তু সেগুলো পালন করার এবং কাজে পরিণত করার জন্য একটু চেষ্টাও করে না। বরং কেবল নফলের পর নফল পড়তে থাকে, আল্লাহর নামে হাজার দানা তাসবীহ জপতে থাকে এবং মধুর কণ্ঠে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতে থাকে। আপনি তার এ ধরনের কার্যাবলী দেকেন, আর বিস্মিত হয়ে বলেনন : 'ওহে ! লোকটা কত বড় অবদ আর কত বড় পরহেযগার।' আপনারদের এ ভুল ধরণর মূলল কারন এই যে, আপনারা 'ইবাদাত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ মোটেই জানেন না।

আর একজন চাকরের কথা ধরুন। সে রাত-দিন কেবল পরের কাজ করে, অন্যের আদেশ শুনে এবং পালন করে, অন্যের আইন মেনে চলে এবং তার প্রকৃত মনিবের যত আদেশ ও ফারমানই হোক না কেন, তার বিরোধিতা করে। কিন্তু 'সালাম' দেয়ার সময় সে তার প্রকৃত মনিবের সামনে উপস্থিত হয় এবং মুখে কেবল তার নাম জপতে থাকে। আপনাদের কারো কোন চাকর এরূপ করলে আপনারা কি করবেন? তার 'সালাম' কি তার মুখের ওপর নিক্ষেপ করবেন না? মুখে মুখে সে যখন অপনাকে মনিব বলে ডাকবে তখন অপনি তি তাকে একথা বলবেননা যে, তুই ডাহা মিথ্যা বাদী ও বেঈমান ; তুই আমার বেতন খেয়ে অণ্যের তাবেদারী করিস, মুখে আমাকে মনিব বলে ডাকিস, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেবল অন্যেরই কাজ করে বেড়াস? এটা যে নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির কথা এটা কারো কুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্যের কথা ! যারা রাত-দিন আল্লাহর আইন ভঙ্গ কররে, কাফের ও মুশরিকদের আশষ অনুযায়ী কাজ করে এবং নিজেদের বাস্তব কর্মজীবনে আল্লাহর বিধানের কোন পরোয়া করে না ; তাদের নামায - রোযা, তাসবীহ পাঠ, কুরআনে তেলাওয়াত, হাজ্জ, যাকাত ইত্যাদিকে আপনি ইবাদাত বলে মনে করেন। এ ভুল ধারণারও মূল কারণ ইবদাত শব্দের প্রকৃতি অর্থ না জানা।

আর এটি চাকরের উদাহরণ নিন। মনিব তার চাকরদের জন্য যে ধরণের পেশাক নির্দিষ্ট করেছেন, মাপ-জোখ ঠিক রেখে সে ঠিক সেই ধরণের পোশাক পরিধান করে, বড় আদব ও যত্ন সহকারে সে মনিবের সামনে হাজির হয়, প্রত্যেকটি গুকুম শুনা মাত্রই মাথ নত করে শিরোধার্য করে নেয় যেন তার তুলনায় বেশী অনুগত চাকর আর কেউই নয়। 'সালাম; দেয়ার সময় সে এককোবারে সকলের সামনে এস দাঁড়ায় এবং মনিবের নাম জপবার ব্যাপারে সমস্ত চাকরের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিষ্ঠা প্রমাণ করে; কিন্তু অন্যদিকে এ ব্যক্তি মনিবের দুশমন এবং বিদ্রোহীদের খেদমত করে, মনিবের বিরুদ্ধে তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে এবং মনিবের নাম পর্যন্ত দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে তারা যে চেষ্টাই করে, এ

হতভাগা তার সহযোগীতা করে ; রাতের অন্ধকারে সে মনিবের ঘরে সিঁদ কাটে এবং ভোর হলে বড় অনুগত চাকরটির ন্যয় হাত বেঁধে মনিবের সামনে হাজির হয়, এ চাকরটি সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? অপনি নিশ্চই তাকে মুনাফিক , বিদ্রোহী ও নিমকহারাম প্রভৃতি নামে অভিহিত করতে একটুও কুণ্ঠিত হবেন না। কিন্তু আল্লাহর কোন চাকর যখন এ ধরনের হাস্যকর আচরণ করতে থাকে তখন তাকে আপনারা কি বলতে থাকেন? তখন আপনারা কাউকে 'পীর সাহেব' কাউকে 'হযরত মাওলানা' কাউকে বড় 'কামেল' ,'পরহেজগার' প্রভৃতি নামে ভূষিত করেন । এর কারন এই যে, আপনারা তাদের মুখে মাপ মত লম্বা দাড়ি দেখে, তাদের পায়জামা পায়ের গিরার দু ' ইঞ্চি ওপরে দেখে, তাদের কপালে নামাযের কালো দাগ দেখে, এবং তাদের লম্বা লম্বা নামায ও মোটা মোটা দানার তাসবীহ দেখে, বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন ; এদের কে বড় দ্বীনদার ও ইবাদাতকারী বলে মনে করেন । এ ভুল শুধু এজন্য যে, 'ইবাদাত' ও দ্বীনদারীর ভুল অর্থই আপনাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে।

আপনি হয়তো মনে করেন হাত বেঁধে কেবলামুখি হয়ে দাড়ানো, হাঁটুর ওপর হাত রেখে মাথা নত করে , মাটিতে মাথা রেখে সিজদা করা এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা- শুধু এ কয়টি কজই প্রকৃত ইবাদাত । হয়ত আপনি মনে করেন, রমযানের প্রথম দিন হতে শাওয়লের চাঁদ উঠা পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার বন্ধ রাখার নাম ইবাদাত। আপনি হয়তো এটাও মনে করেন যে, কুরআন শরীফের কয়েক রুকু, পাঠ করার নামই ইবাদাত, আপনি বুঝে থাকেন মক্কা শরীফে গিয়ে কা'বা ঘরের চারদিকে তাওয়াফ করার নামই ইবাদাত। মোটকথা, এ ধরনের বাহ্যিক রূপকে আপনারা 'ইবাদাত' মনে করে নিয়েছেন এবং এধরনের বাহ্যিক রূপ বজায় রেখে উপরোক্ত কাজগুলো থেকেই সমাধা করলেই আপনারা মনে করেন যে, 'ইবাদাত' সুসম্পন্ন করেছে এবং (ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন) এরউদ্দেশ্য পূর্ণ করেছে। তাই জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে সে একেবারে আযাদ- নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী কাজ করে যেতে পারে ।

কিন্তু প্রকৃত ব্যপার এই যে, আল্লাহ তায়ালা যে ইবাদাতের জন্য আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যে ইবাদাত করার আদেশ আপনাকে দেয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস । সেই ইবাদাত এই যে, আপনি আপনার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তেই আল্লাহর অনুগত্য স্বীকার করে চলবেন এবং আল্লাহর আইনের বিরোধী এ দুনিয়ায় যা কিছু প্রচলিত আছে তা অনুসরণ করতে আপনি একেবারে অস্বীকার করবেন। আপনার প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি গতিবিধি আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে হতে হবে। এ পন্থায় যে জীবনযাপন করবেন তার সবটুকুই ইবাদত বলে গন্য হবে। এ ধরনের জীবনে আপনার শয়ন-জাগরণ, পানাহার ,চলা-ফিরা , কথা বলা, অলোচনা করাও ইবাদত বিবেচিত হবে। এমন কি নিজ স্ত্রীর কাছে যাওয়া এবং নিজের সন্তানদেরকে স্নেহ করাও ইবাদাতের শামিল হবে। যে সকল কাজকে আপনারা 'দুনিয়াদারী' বলে থাকেন তাও 'ইবাদত' এব 'দ্বীনদারী' হতে পারে ---- যদি সকল বিষয় আপনি আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে কে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে সমাধা করেন ; আর পদে পদে এদিকে লক্ষ্য রাখেন যে, আল্লাহর কাছে কোন্ টা জায়েয আর কোন্টা নাজায়েয, কি হালাল আর কি হারাম, কি ফরয আর কি নিষেধ, কোন কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট আর কোন কাজে হন অসন্তুষ্ট। উদাহরন হিসেবে বলা যায়, আপনি রুজি ও অর্থোপার্জনের জন্য বের হন। এ পথে হারাম উপার্জনের অসংখ্য সহজ উপায় আপনার সামনে আসবে। এখন আপনি যদি আল্লাহকে ভয় করে সেই সুযোগ গ্রহণ না করেন এবং কেবল হালাল রুজি ও অর্থ উপার্জন করেন এ কাজে যে সময় লেগেছে তা সবই ইবাদাত এবং এ হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থ ঘরে এনে আপনি নিজে খান আর পরিবার-পরিজনের খাদ্যের ব্যবস্থা করেন, সেই সাথে যদি আল্লাহর নির্ধারিত অন্যান্য হকদারের হকও আদায় করেন, তাহলে এসব কাজেও আপনি অসীম সাওয়াব পাবেন। পথ চলার সময় আপনি পথের কাঁটা দূর করেন এ ধারণায় যে, এটা দ্বারা আল্লাহর কোন বান্দাহ কষ্ট পেতে পারে তবে এটাও আপনার ইবাদত বলে গণ্য হবে। আপনি কোন রুগ্নব্যক্তিকে শুশ্রূষা করলেন, কোন ব্যক্তিকে পথচলতে সাহায্য করলেন, কিংবা বিপন্ন ব্যক্তিকে চলতে সাহায্য করলেন তবে এটাও ইবাদাত হবে। কথাবার্তা বলতে আপনি মিথ্যা, গীবত, কুত্সা রটনা, অশ্লীল কথা বলে পরের মনে আঘাত দেয়া ইত্যাদি পরিহার করেন এবং আল্লাহর ভয়ে কেবল সত্য কথাই বলেন তবে যতক্ষণ সময় অপনার এ কাজে ব্যয় হবে, তা সবই ইবাদাতে অতিবাহিত হবে।

অতএব চেতনা লাভের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর আইন অনুযায়ী চলা এবং তাঁরই নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করার নামই হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাত। এ ইবাদাতের জন্য কোন সময় নেই। এ ইবাদাত সবসময়ই হওয়া চাই, এ ইবাদাতের জন্য কোন নির্দিষ্ট প্রকাশ্য রূপ নেই, কেবল প্রতিটি রূপের প্রত্যেকটি কাজেই আল্লাহর ইবাদাত হতে হবে। আপনি একথা বলতে পারেন না যে , আমি অমুক সময় আল্লাহর বান্দাহ আর অমুক সময় আল্লাহর বান্দাহ নই। আপনি

এথাও বলতে পারেন না যে, অমুক সময় আল্লাহর ইবাদাতের জন্য , আর অমুক সময় আল্লাহর কোন ইবাদাত করতে হয় না। এ আলোচনা দ্বারা আপনারা ইবাদাত শব্দের অর্থ ভাল রূপে জানলেন একথা বুঝতে পারলেন যে, প্রত্যক মুহূর্তে সকল অবস্থায় আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করে চলার নামই ইবাদাত। এখানে আপনি এ প্রশ্ন করতে পারেন যে, তাহলে এ নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদিকে কি বলা যায়? উত্তরে আমি বলবো যে, এসব ইবাদত বটে, এ ইবাদাত গুলোকে আপনার ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে শুধু এজন্য যে, আপনার জীবনে প্রধান ও বৃহত্তম উদ্দেশ্য যে, প্রতি মূহূর্তে ও প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর ইবাদাত করা, সেই বিরাট উদ্দেশ্য আপনি এসবের মাধ্যমে লাভ করবেন। নামায আপনাকে দৈনিক পাঁচরার স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার দাস---- তাঁরই বন্দেগী করা তোমার কর্তব্য ; রোযা বছরে একবার পূর্ণ একটি মাস আপনাকে এ বন্দেগী করার জন্য প্রস্তুত করে, যাকাত আপনাকে বার বার মনে করিয়ে দেয় যে, তুমি যে অর্থ উপার্জন করেছো তা আল্লাহর দান, তা কেবল তোমার খেয়াল-খুশী মত ব্যয় করতে পার না। বরং তা দ্বারা তোমার মালিকের হক আদায় করতে হবে। হজ্জ মানব মনে আল্লাহ প্রেম ও ভালবাসা এবং তাঁর শ্রেষ্টত্বের অনুভুতির এমন চিত্র অঙ্কিত করে যে, একবার তা মুদ্রিত হলে সমগ্র জীবনেও মন হতে তা মুছে যেতে পারে না। এসব বিভিন্ন ইবাদাত আদায় করার পর আপনার সমগ্র জীবন যদি আল্লাহর ইবাদাতে পরিণত হবার উপযুক্ত হয় তবেই আপনার নামায প্রকৃত নামায হবে, রোযা খাঁটি রোযা হবে, যাকাত সত্যিকার যাকাত এবং হজ্জ আসল হজ্জ হবে এতে সন্দেহ নেই । কিন্তু এ উদ্দেশ্য হাসিল না হলে কেবল রুকু-সিজদাহ, অনাহার - উপবাস, হজ্জের অনুষ্ঠান পালনকরা এবং যাকাতের নামে টাকা ব্যায় করলে আপনার কিছুই লাভ হবে না। বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলোকে মানুষের একটি দেহের সাথে তুলনা করা যেতে পারে । এতে প্রান থাকলে এবং চলাফিরা বা কাজ - কর্ম করতে পারলে নিসন্দেহে তা জীবিত মানুষের দেহ, অন্যথায় তা একটি প্রানহীন দেহ মাত্র । লাশের চোখ, কান, হাত, পা সব কিছুই বর্তমান থাকে ; কিন্তু প্রাণ থাকে না বলেই তাকে আপনারা মাটির গর্তে পুতে রাখেন। তদ্রুপ নামাযের আরকান - আহকাম যদি ঠিকভাবে আদায় করা হয় কিংবা রোযার শর্তাবলী ও যদি যাথাযথ ভাবে প্রতি পালিত হয়, কিন্তু হৃদয় মনে আল্লাহর ভয়, আল্লাহর প্রেম - ভালবাসা এবং তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করার ভাবধারা বর্তমান না থাকে ---- ঠিক যে জন্য এসব আপনার ওপর ফরয করা হয়েছিল, হবে তাও একটি প্রাণহীন ও আর্থহীন জিনিস হবে , তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আপনাদের ওপর এই যে, বিভিন্ন ইবাদাত ফরয করা হয়েছে এসব কিভাবে এবং কি উপায়ে আপনাকে সেই আসল ও বৃহত্তম ইবাদাতের জন্য প্রসুতুত করে , সেই ইবাদাতগুলোকে যদি আপনি বুঝে শুনে আদায় করেন , তবে তা থেকে আপনার জীবনে কি প্রভাব প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে পরবতীর্ প্রবন্ধে তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবো- ইনশাআল্লাহ।

নামায

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আমি ইবাদাতের প্রকৃত অর্থ বর্ণনা করেছি। এ 'ইবাদাতের' উদ্দেশ্যে অল্লাহ তায়ালা মানুষ ও জ্বিন জাতি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে আল্লাহ তায়ালার খাঁটি বান্দাহ হিসাবে প্রস্তুত করার জন্য ইসলামে কয়েকটি নির্দষ্ট ইবাদত ফরয করা হয়েছে। সুতরাং এবারে কেবল 'নামায' সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে চাই।

অপনারা পূর্বের প্রবন্ধে জানতে পেরেছেন যে, 'ইবাদাত' এর আসল অর্থ বন্দেগী বা দাসত্ব করা। তাই অপনাকে যখন শুধু দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তখন আপনি কখনো এবং কোন অবস্থাতেই অল্লাহর দাসত্ব হতে মুক্ত হতে পারেন না। 'এত মিনিট কিংবা এত ঘন্টার জন্য আমি আল্লাহর দাস, অন্য সকল সময় তা নই' -- এ কথা আপনি যেমন বলতে পরেন না, তদ্রূপ আপনি একথাও বলতে পারেন না , 'আমি এতক্ষণ আল্লাহর ইবাদাতে অতিবাহিত করবো এবং অন্য সময়ে আমার পূর্ণ আযাদী -- তখন যা ইচ্ছা তাই করবো। যেহেতু আল্লাহর গোলাম ---আল্লাহর দাস হিসেবেই আপনার জন্ম হয়েছে। কেবল তাঁর গোলামী ও দাসত্বে অতিবাহিত হওয়াই একান্ত বাঞ্চনীয়, জীবনের কোন একটি মুহুর্তও আপনি তাঁর 'ইবাদাত' ও দাসত্ব হতে মুক্ত হতে পরেন না।

পূর্বে একথাও আপনাকে বলেছি, যে দুনিয়ার কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে এক কোণায় বসে যাওয়া এবং 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' করার নাম ইবাদাত নয়। বরং এ দুনিয়ায় অপনি যে কাজই করুন না কেন তা ঠিক আল্লাহর আইন ও বিধান অনুসারে করার অর্থই হচ্ছে ইবাদাত। আপনার শয়ন-নিদ্রা, আপনার জাগরণ ও বিশ্রাম, পানাহার, চলা-ফেরা -- মোটকথা সবকিছুই আল্লাহর আইন বিধান অনুযায়ী আপনাকে করতে হবে। আপনার স্ত্রী-পুত্র, ভাই -ভগ্নি এবং আত্মীয়গণের সাথে ঠিক আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। বন্ধু - বান্ধবের সাথে হাসি-তামাশা ও কথাবার্তা বলার সময়ও আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা আল্লাহর দাসত্ব-শৃঙ্খল হতে মুক্ত নই। কামাই রোযগারে টাকা - পয়সা আদান - প্রদানের সময়ও আপনাকে প্রত্যেকটি কাজে ও কথায় আল্লাহর বিধি-নিষেধ লক্ষ্য রাখতে হবে এবং কখনো আল্লাহর নিধার্রিত সীমা অতিক্রম করতে পরেন না। রাতের অন্ধকারে কোন পাপের কাজ করা যদি খুবই সহজ হয়ে পড়ে এবং তা করলে কেউ দেখতে পাবে না বলে আপনি মনে করেন, ঠিক তখনো আপনি স্মরণ রাখবেন যে, আর কেউ দেখুক আর নাই দেখুক, আল্লাহ তায়ালা সব কিছু দেখছেন এবং আপনার মনে আল্লাহর ভয় বদ্ধমূল হওয়া উচিত, মানুষের ভয়ে নয়। গভীর জঙ্গলে বসেও যদি কোন পাপের কাজ করতে ইচ্ছা করেন এবং যদি মনে করেন পুলিশ বা অন্য কোন লোক তা দেখতে পবে না, তখনো আপনি কেবল আল্লাহকে ভয় করে পাপ পরিহার করবেন। যখন মিথ্যা কথা, দুনীর্তি, বেঈমানী, যুলুম ও শোষণ করে বহু স্বার্থ লাভ করতে পারেন এবং আপনাকে বাধা দেয়ার কোউ না থাকে, তখনো আপনি আল্লাহকে ভয় করবেন এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির আশাংকায় এ স্বার্থের কাজ থেকে বিরত থাকবেন। পক্ষান্তরে সততা ও ন্যয়-নীতি রক্ষা করে চলায় আপনাকে যদি ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্তও হতে হয়, তথাপি আপনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়ই এ ক্ষতি স্বীকার করতে বিন্দু মাত্র দ্বিধাবোধ করবেন না। অতএব দুনিয়ার বিপুল কর্মজীবন পরিত্যাগ করে (ঘর বা মসজিদের) কোণে বসে তাসবীহ পড়াকে 'ইবাদাত' বলা যায় না। বস্তুত দুনিয়ার এ গোলক ধাঁধায় জড়িত হয়ে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করার নামই 'ইবাদাত'। মুখে কেবল 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' শব্দ উচ্চারণ করাকেই আল্লাহর 'যিকর ' বলা যায় না। দুনিয়ার কাজ-কর্ম ও ঝামেলার কঠিন জালে জড়িত হয়ে আল্লাহকে বিস্মৃত না হওয়াই আসল আলাহর যিকর। যে সকল জিনিস মানুষকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দেয় তাতে জড়িত হওয়া সত্বেও তাঁকে বিস্মৃত না হওয়া, বড় বড় স্বার্থ হাসিলের লোভ এবং বিরাট ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর আইন লংঘন করার যখন সুযোগ এসে যায় তখনও আল্লাহকে স্বরণ করা এবং দৃঢ়তার সাথে তাঁর আইন অনুসরণ করে চলাই সত্যিকার 'যিকরুলালাহ' বা আল্লাহর যিকর। এ যিকরের দিকে ইংগিত করা হয়েছে কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে :

"নামায পূর্ণরূপে আদায় হয়ে গেলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় ; আল্লাহর দান জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা কর এবং এ প্রচেষ্টা ব্যাপদেশে আল্লাহকে খুব বেশী করে স্বরন কর। তবেই সম্ভবত তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।"

(আল জুমআ : ১০)

'ইবাদাতের' এ অর্থ মনে জাগরুক রাখুন এবং গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, এ বিরাট ও বৃহত্তম 'ইবাদাত' যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য কি কি জিনিস অপরিহার্য এবং নামায যে সব জিনিসকে মানুষের মধ্যে কিভাবে সৃষ্টি করে । আল্লাহর খাঁটি 'বান্দাহ' হওয়ার জন্য বার বার একথা স্মরণ করা আবশ্যক যে, আপনি আল্লাহর বান্দাহ এবং প্রত্যেক সময় ও প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সেই আল্লাহর বন্দেগী করাই হচ্ছে আপনার কাজ। এ কথা বার বার স্বরণ করিয়ে দেয় এজন্য আবশ্যক যে, মনুষের মনে একটি 'শয়তান' সবসময়ই উপস্থিত থাকে ; সে সবসময়ই মানুষকে নিজের 'দাস' বানাতে চেষ্টা করে। শয়তানের প্ররোচনা ও গোলক ধাঁধার জাল ছিন্ন করার জন্য মানুষকে প্রত্যক বার বার একথা স্মরণ করিয়ে দেয়া একান্ত আবশ্যক যে, " তুমি কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার দাস, তিনি ছাড়া তুমি কারর দাস নয় --- না শয়তানের , না কোন মানুষের।" একথারই অনুভূতি মানুষের মনে জাগরুক করে দেয় নামায। সকাল বেলা ঘুম ভাংতেই তা সর্বপ্রথম এবং সকল কাজের আগে আপনাকে একথা স্বরণ করিয়ে দেয় এবং দিনের বেলা যখন নানা প্রকার কাজে আপনি মশগুল থাকেন তখনো তিন-তিনবার অপানাকে মনে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং রাত্রিকালে যখন নিদ্রার সময় উপস্থিত হয় , তখন শেষ বারের মত এরই পুনরাবৃত্তি করে । এরূপে আল্লাহর 'দাস' হওয়ার কথা মানুষকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া নামাযের প্রথম উপকার। এ জন্যই কুরআন মজীদে নামাযকে 'যিকর' নামে অভিহিত করা হয়েছে, অর্থাত্ এর দ্বারা অল্লাহকে স্মরণ করা হয়।

তারপর অপনাকে এ জীবনের পদে পদে আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালন করে চলতে হবে, কাজেই কর্তব্য জ্ঞান ও দায়িত্ববোধ আপনার মনে সদা জাগ্রত থাকা বাঞ্ছনীয় এবং তা পালন করার অভ্যাসও আপনার থাকা দরকার। 'কর্তব্য' কাকে বলে এটা যে জানে না সে কখনও আল্লাহর বিধান পালন করতে পারে না। পক্ষান্তরে কর্তব্যের অর্থ যে জানে ; কিন্তু তা সত্তেও যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে সেই কর্তব্য পালন করার কোন অগ্রহ উদ্যোগ তার না থাকে তবে রাত-তিন চব্বিশ ঘন্টার জন্য তাকে যে শত সহস্র আইন বিধান দেয়া হবে তা যে সে ঔকান্তিক নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে পালন করবে, এমন ভরসা কিছুতেই করা যায় না।

যারা পুলিশ কিংবা সৈন্য বিভাগে কাজ করছেন তারা জানেন যে, এ দু'টি বিভাগে কর্তব্যানুভূতি এবং যথাযথভাবে কর্তব্য পালনের ট্রেনিং কত কঠোরতার সাথে দেয়া হয়। রাত-দিনের মধ্যে একাধিকাবার বিউগল বাজানো হয়। সৈনিকদেরকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় এবং তাদের দ্বারা কুচকাওয়ায করানো হয়। এসব কেবল মাত্র কর্তব্য পালনে অভ্যস্ত করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাই এ সমস্ত ব্যাপারে যারা অক্ষম, নিষ্কর্মা ও অযোগ্য প্রমাণিত হয়, যারা 'বিউগলের' আওয়াজ শনেও ঘরে বসে থাকে কিংবা যারা কুচকাওয়াযের সময় নির্দেশ অনুসারে সাড়া না দেয় তাদেরকে প্রথমেই বরখাস্ত করা হয় । তদ্রূপ নামাযও দিন-রাত পাচঁবার 'বিউগল' বাজায় ; যেই 'বিউগল' শুনা মাত্র আল্লাহর সৈণিকগন দৌড়িয়ে আসবে এবং প্রমাণ করবে যে, তারা সকল অবস্থাতেই আল্লাহর আদেশ পালন কতে প্রস্তুত 'বিউগল ' শুনে যারা বসে থাকে, নিজ স্থান হতে একটুও নড়তে যারা প্রসুতুত না হয়, তারা কর্তব্যের অর্থই জানে না, কিংবা কর্তব্যের অর্থ বুঝা সত্ত্বেও আল্লাহর সৈন্য বাহিনীর মধ্যে শামিল হওয়ার যোগ্যতাই তাদের নেই।

এ কারণেই হয়রত (সা) বলেছেন : "যারা আযানের আওয়াজ শুনেও নিজের ঘর হতে বের হয় না তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে আমার ইচ্ছা হয়।" এবং এ জনই হাদীস শরীফে নামায পড়াকেই কুফর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্যের প্রধান চিহ্ন বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। নামায পড়ার জন্য যে ব্যক্তি জামায়াতে হাজির না হতো হযরত (সা) এবং সাহাবাদের যুগে তাকে মুসলমানই বলা হত না। এমনকি যে সব মুনাফিকের মুসলমান হিসেবে পরিণত হওয়ার প্রয়োজন ছিল তারাও নামাযের জামায়াতে শামিল হতে বাধ্য হতো। এজন্যই কুরআন শরীফে মুনাফিকদেরকে এরূপ তিরষ্কার করা হয়নি যে , তারা নামায পড়ে না বরং বলা হয়েছে তারা ঐকান্তি আগ্রহ ও নিষ্ঠা সহকারে নামাযে দাঁড়ায় না, দাঁড়ায় নেহায়েত অবহেলা, অনিচ্ছাও উপেক্ষা সহকারে।

এসব কথা দ্বারা নিসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে , বে-নামাযীকে 'মুসলমান' মনে করার কোন অবকাশ নাই। কারণ, ইসলাম এক নিছক বিশ্বাসমূলক ধর্ম নয় যে , 'কতগুলো কথা' মনে মনে বিশ্বাস করলেই কর্তব্য পালন হয়ে যাবে। বরং এটা সম্পূর্ণ কর্মময় বাস্তব ধর্ম । এমন বাস্তব যে, প্রত্যেকটি মূহুর্ত ইসলাম অনুযায়ী কাজ করা এবং কুফরী ও ফাসেকীর বিরুদ্ধে অনবরত লড়াই করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। এরূপ বিরাট কর্মময় জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে আল্লাহর বিধান পালনের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি সেরূপ প্রস্তুত থাকে না, সে ইসলামের জন্য একেবারে নিষ্কর্মা। ঠিক এ কারণেই দিন-রাতের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানগণ

প্রতকৃতপক্ষে মুসলমান কিনা এবং বাস্তব কর্ম জীবনে সে আল্লাহর হকুম পালন করতে প্রস্তুত কিনা, এর বাস্তব পরীক্ষা এবং প্রমাণ নেবার জনই এ পাঁচ ওয়াক্ত নামযের ব্যাবস্থা । আল্লাহর প্যারেডের 'বিউগল' শুনে কোন মুসলমান যদি বিন্দুমাত্র সাড়া না দেয়, তবে পরিষ্কার প্রমাণিত হবে যে, সে ইসলামের বিধান মত কর্মজীবন যাপন করতে প্রস্তুত নয়। এরপর যদি সে আল্লাহকে ও রাসূলকে বিশ্বাস করে তবে তা একেবারেই অর্থহীন। এ জন্যই কুরআন শরীফে বলা হয়েছে : (বাকারা : ৪৫) অর্থত্ যারা আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় কেবল সেই শ্রেণীর লোকদের পক্ষেই নামায কঠিন কাজ হয়ে পড়ে। আর যাদের কাছে নামায পড়া কঠিন কাজ বলে বিবেচিত হয়, তারা আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত নয় এটাই প্রমাণিত হয়।

তৃতীয়ত, আল্লাহর ভয়। প্রত্যেকটি মুসলমানের মনে এ ভয় সদা-সর্বদা জাগ্রত থাকা একান্ত আবশ্যক। মুসলমান ইসলাম অনুসারে কখনই কাজ করতে পারে না, যদি না তার মনে একই দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সবসময়ই এবং সকল স্থানেই দেখছেন, তার গতিবিধি সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অবহিত। আল্লাহ অন্ধকারেও তাকে দেখছেন, নিতান্ত সংগীহীন অবস্থায়ও আল্লাহ তার সাথী, সমগ্র দুনিয়া হতে আত্মগোপন করা সম্ভব, কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টি হতে লুকিয়ে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। সমগ্র দুনিয়ার সর্বপ্রকার শাস্তি ও শাসন হতে মানুষ বেঁচে যেতে পারে ; কিন্তু আল্লাহর শাস্তি ও শাসন হতে রেহাই পাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ দৃঢ়বিশ্বাসই মনুষকে আল্লাহর বিধন লংঘন করা হতে রিবত রাখে। এ বিশ্বাসের কারণেই জীবনের যাবতীয় কার্যে আল্লাহর নিধার্রিত হালাল-হারামের সীমা রক্ষা করে চলতে মানুষ বাধ্য হয় । এ বিশ্বাস যদি দূর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে মুসলমান কিছুতেই খাঁটি মুসলিম জীবনযাপন করতে পারে না। এ বিশ্বাসকে বার বার স্মরণ করার জন্য এবং ক্রমাগত স্মরণের মাধ্যমে মানব মনে এ বিশ্বাস খুব দৃঢ়তার সাথে বদ্ধমূল করা জন্যই আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। কুরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা নিজেই নামাযের এ স্বার্থকতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন :

"নিশ্চই নামায মানুষকে পাপ, অন্যায় ও অশ্লীলতা এবং লজ্জাহীনতার কাজ হতে বিরত রাখে।" একথার সত্যতা আপনি নিজে চিন্তা করলেই বুঝতে পারেন : আপনি যখন নামায পড়তে যান, তখন পবিত্র হয়ে এবং অযু করে যান, আপনার শরীর যদি নাপাক হয় এবং গোসল না করেই নামাযে হাজির হন, কিংবা আপনি যদি নাপাক কাপড় পরে নামায পড়তে যান, অথবা অযু না থাকা সত্ত্বেও যদি আপনি বলেন যে, আমি অযু করে এসেছি, তাহলে দুনিয়র কোন লোকই আপনাকে ধরতে পরে না। তবুও তা কখনই করেন না। কিন্তু কেন? এজন্য যে, আল্লাহর দৃষ্টি হতে কোন গোনাহ লুকানো সম্ভব নয়, একথা আপনি নিসন্দেহে বিশ্বাস করেন। এমনকি নামাযে যে সব দোয়া সূরা নিশব্দে পড়তে হয়, আপনি যদি তা না পড়েন তবে তাও কেউ জানতে পারে না। কিন্তু এরূপ কাজ আপনি এজন্য করেন না যে , আল্লাহ সব কিছুই শুনতে পান, তিনি আপনার একান্ত কাছে অবস্থিত। তদ্রূপ নিবিড় জঙ্গলে গিয়েও আপনি নামায পড়েন, রাতের অন্ধকারে নামায পড়েন। নিজের ঘরে যখন একেবারে একাকী থাকেন তখনও আপনি নামায পড়েন। অথচ এসব সময় আপনাকে কেউ দেখতে পায় না এবং কেউ জানতে পরে না যে, আপনি নামায পড়েছেন, কি পড়েননি। এর কারণ কি? করণ এই যে, গোপনে-সমস্ত লোক চক্ষুর আড়ালে ও অল্লাহর হুকুম লংঘন করতে অপনি ভয় পান এবং আপনি নিসন্দেহে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর দৃষ্টি হতে কোন অপরাধ গোপন করা সম্ভব নয়। এর দ্বারাই আপনি অনুমান করতে পরেন যে, নামায মানব মনে আল্লাহকে কিভাবে জাগ্রত রাখে এবং আল্লাহ যে হাযের-নাযের, সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী, এ বিশ্বাস কিভবে খুবই দৃঢ়তার সাথে মানব মনে বদ্ধ মূল করে দেয়। বস্তুত এ ভয় এবং এ দৃঢ় বিশ্বাস আপনার মনে বদ্ধমূল ও সদাজাগ্রত না থাকলে রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টা আপনি আল্লাহর ইবাদাত ও বন্দেগী কিরূপে করতে পারেন? আপনার মনে এ ভয় যদি না থাকে তবে রাত-দিনের অসংখ্য কাজ-কর্মে আল্লাহকে ভয় করে ন্যায় ও পুণ্যের পথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এবং সকল প্রকার পাপ ও নাফরমানী হতে দূরে থাকা আপনার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হতে পারে?

চতুর্থত, ইবাদাত করার জন্য আল্লাহর আইন পূর্ণরূপে জেনে নেয়া আপনার পক্ষে অপরিহার্য। কারণ আইন না জানলে আপনি তা অনুসরণ করবেন কিরূপে? নামাযই আপনার এ প্রয়োজন পূর্ণ করে। নামাযের মধ্যে কুরআন শরীফের আয়াত পাঠ করার বিধান এজন্যেই দেয়া হয়েছে। এর সাহায্যে দিন-রাত আপনি আল্লাহর আইন ও বিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। জুময়ার নামাযের পূর্বে 'খোতবা'র নিয়মও এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, এর দ্বারা আপনি ইসলামের বিধান জানতে পারেন। জামায়াতের সাথে নামায ও জুমআর নামায পড়ার আর একটি উপকারিতা এই যে, এ উদ্দেশ্যে আলেম ও অশিক্ষিত লোকদের এক স্থানে বার বার একত্র হতে হয় এবং সকলের পক্ষেই আল্লাহর বিধান জানার অপূর্ব সুযোগ ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা নামাযে যা কিছু পড়েন তা থেকে আল্লাহর হুকুম জানতে চেষ্টা করেন না, জুমআর খুতবা এমন

ভাবে দেয়া হয় যে, বারবার শোনার পরও ইলাম সম্পর্কে আপনাদের কোন জ্ঞান হয় না এবং জামায়াতের সাথে নামায পড়ার জন্য একত্র হওয়া সত্ত্বেও না আলেমগণ অশিক্ষিতগণকে কিছু শিক্ষা দেন, না অশিক্ষিত লোকেরা আলেমদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করেন, একে দুভার্গ্য ছড়া আর কি বলা যেতে পারে? নামায আপনাদেরকে এ বিষয়ে অবাধ সুযোগ করে দেয়। আপনারা যদি তা থেকে এ উপার লাভ না করেন, তবে নামাযের অপরাধ কি?

পঞ্চমত, জীবনের এ বিরাট কর্মক্ষেত্রে মুসলমান নিসঙ্গ থাকতে পারে না বরং সমস্ত মুসলমানদের একত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা, মিলিতভাবে আল্লাহর বিধান পালন করার তাঁর বিধান অনুযায়ী নিজেরদের জীবন গঠন করা এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইন জারী করার জন্য একে অপরের সহযেগীতা করা তাদের অবশ্য কর্তব্য। আপনি জনেন যে, এ জীবনে ক্ষেত্রে একদিকে মুসলমান --- আল্লাহর অদেশানুগত বন্দাহ এবং অন্যদিকে আল্লাহদ্রোহী ও কাফের লোকদের দল রয়েছে। রাত-দিন আল্লাহর আদেশ পালন এবং আল্লাহদ্রোহীতার মধ্যে অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম চলছে। কাফেরগণ আল্লাহর আইন লংঘন করতে এবং এর বিরুদ্ধে দুনিয়ায় শয়তানের আইন জারী করছে, এদের মোকাবিলায় এক একটি 'মুসলমান' বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলে কখনও জয় লাভ করতে পারে না। তাই আল্লাহর বান্দাদের পক্ষে একত্র হয়ে একটি মিলত ঐক্য শক্তির বলে আল্লাহর দুশমনদের সাথে মোকাবিলা করা এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইন জারীর চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু নামায ভিন্ন আর কিছুই এ বিরাট ঐক্য শক্তি গঠন করতে পারে না। দিন-রাত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামায়াত , সাপ্তাহিক জুমআর নামাযের বড় জামায়াত, তার পর বছরে দু'ঈদের নামাযের বিরাট সম্মেলন --- এসব কিছু মিলে মুসলমানদেরকে একটি সুদৃঢ় দেয়ালের মত গড়ে তোলে এবং তাদের মধ্যে চিন্তা,ভাব , মত ও কর্মের সেই ঐক্য জগিয়ে তোলে যা মুসলমানদের কে নিত্য নৈমিত্তিক কাজে পরস্পরের সহায্যকারী রূপে গড়ে তোলার জন্য একান্ত অপরিহার্য।

নামাযে কি পড়েন

নামায মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত, দাসত্ব ও আনুগ্যত স্বীকার করে চলার জন্য কিভাবে প্রস্তুত করে, তা পূর্বে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করছি। এ প্রসঙ্গে যা কিছু লেখা হয়েছে তা পাঠ করে আপনি পরিস্কারভাবে বুঝতে পেরেছেন যে একজন মানুষ যদি আল্লাহর হুকুম এবং ফরয মনে করে রীতিমতো নামায আদায় করে, তবে সে নামাযে দোআ ও সুরাগুলের কোন অর্থ বুঝতে না পারলেও এ নামাজ তার মনে আল্লাহর ভয়ে, আল্লাহর হাজের-নাযের হওয়ার কথা এবং আদালতে একদিন উপস্থিত হওয়ার বিশ্বাস নিসন্দেহে সবসময়ই জাগরুক রাখবে । সবসময় সে মনে করবে যে, সে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন দাস নয়- আল্লাহই তার প্রকৃত বাদশাহ এবং প্রভু। এরই ফলে তার মধ্যে কর্তব্য পালনের অভ্যাস হবে এবং সকল অবস্থায়ই সে আল্লাহর বিধান পালন করবে চলার জন্য প্রসতুত থাকবে । মানুষের সমগ্র জীবনকে আল্লাহর বন্দেগীর অধীনে যাপন করতে এবং গোটা জীবনকে এবাদাতে পরিনত করতে হলে যে সব গুন -সিফাত অবশ্য প্রয়োজনীয় তাও এ নামাযের সাহায্যে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় । নামায দ্বারা এ উপকার কিরূপে লাভ করা যায় তাতে

আপনার পূর্বের প্রবন্ধে ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন আশা করি৷

জামায়াতের সাথে নামায

আগের প্রবন্ধগুলোতে আমি শুধু নামাযের বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতার কথাই বলেছি। তা দ্বারা আপনারা নিশ্চই বুঝতে পেরেছেন যে, এটা কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এ নামায মনুষের মধ্যে জীবন ব্যাপী বন্দেগীর ভাবধারা কেমন করে জন্মায় এবং কেমন করে তাকে এ বন্দেগীর হক আদায়ের যোগ্য করে তোলে - সে কথাও অপনারা বুঝতে পেরেছেন। এক্ষণে আমি জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের উপকারিতার কথা আপনাদেরকে বলবো। তা দ্বারা আপনারা খুব ভাল করে বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ দয়া ও অনুগ্রহ করে এ একই জিনিসের মধ্যে সবরকমের নিয়ামত কিভাব জমা করে রেখেছেন। শুধু নামাযই আমাদেও পক্ষে কম ছিল না ; কিন্তু সেই সাথে জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের আদেশ কররে আল্লাহ পাক এটাকে দ্বিগুণ উপকারিতার ভান্ডার করে দিয়েছেন এবং তাতে এক অপূর্ব শক্তি দান করেছেন, যা মনুষের মধ্যে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি করতে অতুলনীয়।

পূর্বেই বলেছি, জীবনের সর্বক্ষণ নিজেকে আল্লাহর বান্দাহ বলে মনে করা, অনুগত গোলামের ন্যায় মালিকের অধীন হয়ে থাকা এবং মালিকের হুকুম পালনের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকার নামই হচ্ছে ইবাদাত, আর নামায মানুষকে এ ইবাদাতের জন্যই প্রস্তুত করে । এরূপ ইবাদাতের জন্য মানুষের মধ্যে যতগুলো গুণের দরকার, নামায তার সবই মনুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। দাস হওয়ার অনুভূতি, আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর কিতাবের প্রতি ঈমান, পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহভীতি, আল্লাহকে 'আলেমুল গায়েব' বলে স্বীকার করা, তাকে সবসময়ই নিজের কাছে অনুভব করা, আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য সর্বদা নিজেকে প্রস্তুত রাখা, আল্লাহর গুকুমগুলো ভাল করে জানা --- নামায এ ধরনের বহু গুণই মনুষের মধ্যে সৃষ্টি করে এব তাকে আল্লাহ তালার খাঁটি বান্দাহরূপে গড়ে তোলে।

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে, মানুষ নিজে যতই গুণসম্পন্ন হোক না কেন, অন্যান্য মানুষ যতক্ষণ তাঁর সহযোগী ও সাহায্যকারী না হবে ততক্ষণ সে আল্লাহর বন্দেগীর 'হক' পূর্ণরূপে আদায় করতে পারবে না। মানুষ যাদের সাথে দিন-রাত জীবনযাপন করে সবসময় যাদের সাথে একত্রে কাজ করে, আল্লাহর ফরমাবরদারী করার ব্যাপারেও তারা যদি সহযেগীতা না করে, হবে সে কিছুতেই আল্লাহর হুকুম পালনে সমর্থ হয় না।

মানুষ দুনিয়ায় একাকী আসেনি। একাকী থেকে সে কিছু করতেও পারে না। সে পাড়া-প্রতিবেশী ও সহকমীর্ এবং জীবন পথেও সঙ্গী-সাথীদেও সাথে নানাভাবে জড়িত। আল্লাহর হুকুম আহকামও কোন নিসঙ্গ একটি মানুষের জন্য নয়, বরং সকল মানুষের জন্য --- জীবনের সকল প্রকার সম্পর্ক সম্বন্ধ সঠিকভাবে বজায় রাখার জন্যই তা আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। এখন আল্লাহর হুকুম পালন করার ব্যাপারে যদি সবাই পরস্পরকে সাহায্য করে, সহযোগগিতা করে, তবেই তারা এক সাথে আল্লাহর হুকুম পালনকারী হতে পারে। পক্ষন্তরে সকলে মিলে যদি আল্লাহ নাফরমানী শুরু করে কিংবা তাদের পারস্পরিক

সম্পর্ক যদি এমন হয় যে, আল্লাহর আদেশ পালনে পরস্পর সহযোগিতার না না করে , তবে একজন লোকের পক্ষে সঠিকভাবে নিয়মিত আল্লাহর হুকুম পালন করা এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে কাজ করা একেবারেই অসম্ভব।

আপনারা যদি বিশেষ লক্ষ্যের সাথে কুরআন পাঠ করেন, তাহলে জানতে পারবেন যে, আল্লাহর তায়ালা কেবল আপনাকে আল্লাহর অধীন ও অনুগত হতে এবং আল্লাহর হুকুম পালন করে চলতে বলেন নি। বরং সেই সাথে আপনাক এ আদেশও দেওয়া হয়েছে, আপনি সমগ্র দুনিয়াকে আল্লাহর অধীনের অনুগত করে দিবেন, দুনিয়াতে আল্লাহর আইন জারী করবেন। দুনিয়ার যেখানে যেখানে 'শয়তানের' আইন চলছে, তা বন্ধ করবেন এবং সে স্থানে এক ও লা-শরীক আল্লাহ তাআলার আইনের হুকুমাত কায়েম করবেন। আপনার প্রতি আল্লাহ এতে যে, বিরাট খেদমতের আদেশ দিয়েছেন একজন লোকের পক্ষে এ কাজ সমাধা করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। এ মতে বিশ্বাসী কোটি কোটি মুসলমানও যদি হয়ে আর তার বিভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে --- তাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ বা সম্পর্ক না থাকে তবে তারাও 'শয়তানের' সুশৃংখলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তিকে কিছুতেই পরাজিত করতে পারবে না। এজন্যই মুসলমানদেও দলবদ্ধ হওয়া ও পরস্পরকে সহায্য করা, একে অন্যেও পৃষ্ঠ-পোষক ও সমর্থক হয়ে দাড়ান এবং সকলে একই উদ্দেশ্যে হাসিল করার জন্য সম্মিলতভাবে সংগ্রাম-সাধনা করা অপরিহার্য।

একটু গভীরভাবে দেখলে একথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এতবড় বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মুসলমানদের কেবল মিলিত ও একতাবদ্ধ হওয়াই যথেষ্ট নয়। তাদের মিলিত হতে হবে ঠিক পন্থা অনুসারে অর্থাত্ এমনভাবে মুসলমানদের একটি জামায়াত গঠন করতে হবে, যেন তাদের পরস্পরের সাথে সঠিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় --- তাদের পরস্পরের সম্পর্কেও মধ্যে যেন কোনরূপ দোষ-ত্রুটি না থাকে। তাদের মত, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মনীতির পূর্ণ ঐক্য বর্তমান থাকা চাই। তাদের একজন অমির ও নেতা হওয়া দরকার, তাদের মধ্যে সেই নেতার ইশারা অনুসারে কাজ করার আভ্যাস ও স্পৃহা থাকা চই। তাদের কে নেতার হুকুম পালন করতে হবে আর তা কত দূরইবা করতে হবে এবং কোন্ কারণে ঘটলে নেতার বিরধিতাও করা যেতে পারে --- তাও তাদের ভাল করে বুঝে নেয়া আবশ্যক। এ গুলো মনে রখুন এৰং জামায়াতর সাথে নামায পড়লে এসব গুরুত্বপূর্ণ ভাবধারা নামাযীদেও মধ্যে কেমন করে জেগে উঠে তা চিন্তা করে দেখুন।

আযান শোনা মাত্রই সবকাজ-কর্ম ছেড়ে মসজিদের দিকে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। কাজেই আযানের সাথে সাথেই মুসলমানদেও নিজ নিজ কাজ ত্যাগ করা এবং একই কেন্দ্রেও (সমজিদ) দিকে সকলের অগ্রসর হওয়া একটি বিরাট সৈন্যবহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সৈন্য শিবিরে 'বিউগলের' আওয়ায হওয়ার সাথে সাথেই প্রত্যেকটি সৈনিক বুঝতে পারে যে, সেনাপতি সকলকে ডাকছেন। এ সময় সকলের মনে একই ভাব উদয় হয়। সেই ভাব হচ্ছে সেনাপতির নির্দেশ পালনের কর্তব্য ও দায়িত্ব। একথা মনে হওয়ার সাথে সাথে সকলে একই কাজ করে, অর্থাৎ যে যে খানে আছে সেখানে হতে সে আওয়ায শোনা মাত্র নির্দিষ্ট স্থানের দিকে দৌড়াতে থাকে। সৈন্যদেও জন্য এ অনন্য পন্থা কেন গ্রহণ করা হয়ছে।? প্রথম এজন্য যে যেন আলাদাভাবে প্রত্যেকটি সৈনিকের মধ্যে হুকুম পালন করার এবং হুকুম পলনের জন্য সবসময়ই প্রস্তুত থাকার অভ্যাস হবে। দ্বিতীয়ত, সেই সাথে এ ধরনের সকল অনুগত সিপাহীদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠিত হবে এবং সেনাপতির আদেশে একই সময় একই স্থানে সমবেত হওয়ার অভ্যাস হবে। এ অভ্যাসটি এজন্য দরকার যে, হঠাত্ কোন ঘটনা যদি দেখা দেয় তখন যেন সকল সিপাহী এই আওয়াযে একইস্থানে হাজির হয়ে কাজ করতে পারে। প্রত্যেক সৈনিক ব্যক্তিগতভাবে যদি খুব বড় বাহাদুর হয়, কিন্তু কাজের সময় ডাকলে অবিলম্বে উপস্থিত হয়ে যদি লড়াই করতে না পারে, তাহলে তাদেরর বাহাদুরিগিরি কোন মূল্য থাকে ন। ডাক দেয়া মাত্র সৈন্যগন যদি একত্র না হয়ে বরং নিজ নিজ ইচ্ছামত একেক দিকে চলে যায়, তবে এ ধরনের হাজার বীর সৈনিককে শত্রপক্ষের পঞ্চাশটি সৈনিকের এশটি শৃংখলাবদ্ধ দল নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে।

ঠিক এ নিয়মেই আযান শুনা মাত্রই কাজ-কর্ম ছেড়ে নিকটস্থ মসজিদে হাজির হবার জন্য মুসলমানকে আদেশ করা হয়েছে যেন সব মুসলমান মিলে আল্লাহর একটি সৈন্যদলে পরিনত হতে পারে। এভাবে দৈনিক পাঁচবার আযান শুনামাত্র হাজির হওয়ার অভ্যাস করানো হয় এজন্য যে, দনিয়ার সকল প্রকার সৈনিকের তুলনায় এ খোদায়ী সেনাদেও কর্তব্য অনেক বেশী, অনেক কঠোর। অন্যান্য ফৌজের পক্ষে বহুকাল পরেও হয়ত যুদ্ধ করার প্রয়োজন পড়েনি এবং কবে কোন্ সময় যুদ্ধ বাধবে সে জন্য বহু পূর্বে থেকেই এত সব ট্রেনিং দেয় হয়। কিন্তু এ খোদায়ী ফৌজকে প্রত্যেক মুহূর্তেই শয়তানী শক্তির সাথে লড়াই করতে হয় এবং প্রত্যেকটি মুহূর্তেই সেনাপতির আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় । এজন্য মুসলমানদের দিন-রাতের মধ্য পাঁচবার খোদায়ী 'বিউগল' ---- আযানের আওয়াযে আল্লাহর শিবির মসজিদের দিকে ছুটতে হয়, বলতে হবে , দায়িত্ব

ও কর্তব্যেও তুলনায় তাদের প্রতি এটাকে অনেক অনুগ্রহ করা হয়েছে সন্দেহ নেই। এ যাবত শুধু আযানের সৌন্দর্যের কথাই আলোচনা করা হয়েছে। আযান শুনে সকল মুসলমান মসজিদে হাজির হয় কেবল সে জামায়েতের মধ্যেই অনেক সৌন্দর্য-সার্থকতা নিহিত ওয়েছে। এখানে মিলিত হয় মসলমানগণ পরস্পরকে দেখতে পান, চিনতে ও পরিচয় লাভ করতে পারেন।

কিন্তু আপনারা পরস্পরের সাথে এই যে মিলিত ও পরিচিত হন, তা কোন্ সূত্রে ? এ সূত্রে যে, আপনারা এক আল্লাহর বান্দাহ, এক রাসূলের অনুসরণকারী, এক কুরআন শরীফই আপনাদের সকলেরই কিতাব---- জীবন বিধান এবং আপনাদের সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য এক। সেই একই উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য আপনারা মসজিদে একত্রিত হয়েছেন এবং এখানে থেকে ফিরে যাওয়ার পর ও অপনারা প্রত্যোকেই সে একই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চেষ্টা করবেন ; বস্তুত এ ধরনের পরিচয় এবং এরূপ সাহচর্য স্বাভাবিক ভাবে আপনদের মনে এ খেয়াল জাগিয়ে দেয় যে, আপনার সকলেই একটি জাতির অন্তভূক্ত, একই ফৌজের সিপাহী আপনারা । আপনাদের একে অপরের ভাই। দুনিয়ায় আপনাদের জীবেনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক, আপনাদের লাভ-লোকসানে সকলেই আপনারা শরীক ও অপনাদের পরস্পরের জীবন একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত।

আপনারা যখন পরস্পরের দিকে তাকাবেন তখন ঠিক চোখ-মন অন্তর খুলে উদার দৃষ্টিতে তাকাবেন। শত্রুযে দৃষ্টিতে দেখে থাকে অপনারা কারো প্রতি সেভাবে তাকান না বরং বন্ধু যেরূপ বন্ধুর দিকে তাকায়, ভাই যে চোখে ভাইয়ের দিকে তাকায়, ঠিক সেই দৃষ্টিতেই একজন অপরজেনের প্রতি তাকিয়ে থাকেন। এভাবে তাকাবার ফলে আপনি যখন কোন ভাইকে পুরাতন ও ছেড়া কাপড় পরিহিত দেখতে পাবেন, কাউকে বিশেষ চিন্তিত বিপদগ্রস্ত বা ক্ষুধার্ত দেখবেন, কাইকে দেখবেন অক্ষম-পংগু, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও অন্ধ তখন অপনার অন্তরে আপনা আপনিই সহানভুতি ও দয়ার উদ্রেক হবে। অপনারা ধনী লোকেরা গরীব ও অসহায় দুঃস্থদের দুঃখ অনুভব করবেন, ফকীর-মিসকিন লোকেরা ধনীদের কাছে পৌঁছে নিজেদের দুরবস্থার কথা বলার সহস পবে। কারো সম্পর্কে যদি আপনি জানতে পারেন, যে সে অসুস্থ কিংবা বিপদগ্রস্ত বলে মসিজিদে আসতে পারেন নি তখন তাকে দেখতে যাবার জনুয্য অপানার মনে অগ্রহ হবে। কারো মৃত্যুর্ সংবাদ পেলে জানাযা পড়তে যেতে পারেন এবং তার শোকসন্তপ্তপরিবারবর্গের পৃতি সমবেদনা প্রকাশ করতে পারেন। বস্তুত এ কাজই আপনাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসা ও সহানুভুতি সৃষ্টি করবে।

আর একটু ভেবে দেখুন --- অপনারা যেখানে একত্র হন তা একটি পাক পবিত্র স্থান। এ পাক স্থানে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে অপনারা একত্রিত হয়ে থাকেন। চোর-ডাকত, শরাবী আর জুয়াড়ী দলও একস্থানে একত্র হয় বটে ; কিন্তু তাদের সকলের মন অসত্ ইচ্ছায় পরিপুর্ণ থাকে। কিন্তু অপনাদের সমবেত হওয়াকে এদর সাথে তুলনা করা যায় না। কারণ এখনে আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণই একতি হয়ে থাকেন --- আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আপনাদের এ সম্মেলন আল্লাহর ঘরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আল্লাহর সামনে বন্দেগী ও দাসত্বের খালেছ মনে স্বীকার করার জন্যি এখনে সকলে সবমসেত হন। এমতাতাবস্থায় ইমানদার লোকদের মনে অপানা আপনি নিজ নিজ গুনাহের জন্য লজ্জার অনুভূতি জেগে উঠে। অন্য দিকে যদি কোন মানুষ অন্য কারো সামনে কোন গুনাহের কাজ করে থাকে, আর সেই ব্যক্তি যদি মসজিদে হাজির হয়, তাহলে কেবল এতেই গুনাহগার ব্যক্তি লজ্জায় মরে যায়। উপরন্তু মুসলমানদের মনে পরস্পরকে উপদেশ দেয়ার ভাবও যদি বর্তমান থাকে এবং সে যদি দরদ ভালবাসা ও সহানুভুতির সাথে একজনের দোষত্রুটি কেমন করে দূর করা যায়, তা ভাল করে জেনে নেয়, তবে তাদের এ সম্মেলনের প্রতি আল্লাহর অশেষ রহমত ও বরকত নাযিল হবে--- তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এভাবে জামায়াতে নামায পড়ার সুযোগে এক মুসলমান অন্য মুসলমানের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করতে পারবেন--- একজন অন্যজনের অভাব পূরণ করবেন। ফলে ধীরে ধীরে গোটা সমাজই সৎ ও নেককার হতে পারবে।

amarboi.org
boipori.com